ওয়াহিদুল হক ঃ রাজনীতি ও সংস্কৃতি

বার্ট্রান্ড রাসেলের প্রভাব আমাদের জীবনে কম নয়। বস্তুত মার্ক্সেরও ততটা কিনা আমি নিশ্চিত নই। তাঁর স্কেপটিসিজম খেল আমার সরল বিশ্বাসী মনটাকে। মার্ক্সিস্ট মাত্রেই যেমনটা সরল বিশ্বাসী হয়, স্বাপ্নিক হয়, এবং বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বস্ত হয় যেমনটা ধর্মবিশ্বাসী ঈশ্বরবিশ্বাসীও হতে চায় সেই মনটা আমার গেল। নরনারী সম্পর্ক বিষয়ে, বিবাহ নামের প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে নৈতিকতাও একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানই বটে তারও বিষয়ে আমার জন্মাবধি পেয়ে যাওয়া ভিতগুলিকে দিয়েছেন এমন করে ঝাঁকিয়ে যা অনেক দূর নৃতত্ত্ব পড়লেও হয় না। শেষে কিনা পেলেন সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ। তাড়াতাড়ি গরুখোঁজা করে পেয়ে যাই স্যাটান ইন দি সাবার্ব। তখন আমরা বেশ ছেলেমানুষ।

কিন্তু দার্শনিকপ্রবরের শ্রেষ্ঠ কাজ নাকি প্রিন্সপিয়া ম্যাথাটিকা। যা কিনা নিউটনেরও বইয়ের নাম বুঝি এবং যা তিনি লিখেছেন আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেডকে সঙ্গে করে। বইটা যতটাই রাসেলের ততটাই হোয়াইটহেডের লেখা অথচ হোয়াইটহেড বিংশ শতাব্দীর অগ্রণী চিন্তনায়ক, আমাদেরকে যেন কিছুমাত্র প্রভাবিত করেননি। সম্ভবত তিনি রাসেলের মত লিখিয়ে না বলেই। তাঁর লেখা পেয়েছি নানা সময়ে, কোন লেখাই শেষ করে উঠতে পারিনি। কিন্তু কিছু কিছু কথা তাঁর থেকে থেকে মনে পড়ে। গত দুইদিন ধরে তাই ঘটছে। পাঠকদের সঙ্গে সে চিন্তাটা ভাগ করে ভোগ না করা পর্যন্ত আমার ঘোর কাটবে না।

বলছেন তিনি, সভ্যতা তো মানব প্রজাতি-মধ্যে পারস্পরিক ব্যবহারবিধিরই বিবর্তন যা গড়েছে মানুষেরই কিছু কতিপয় ধারণা। মানবাত্মা বিষয়ে, মানবিকতার আদর্শ বিষয়ে, স্বাধীনতার ব্যাপ্তি, বৈচিত্র্য, গভীরতা বিষয়ে, বলপ্রয়োগ থেকে কথোপকথনে নিষ্পত্তির শ্রেয়তা বিষয়ে এবং দূরদৃষ্টি বিষয়ে। এই কারণগুলির সুফল পাওয়া গেছে অতি ধীরে, ধীর গতিতে মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সম্মানের বোধ, সহানুভূতি এবং সর্বময় একটা মৈত্রীকরুণার আবহ প্রতিষ্ঠা পাবার পথে। তার মানে পারস্পরিক সম্মান, সহানুভূতি এবং সর্বাত্মক করুণা (বৌদ্ধ অর্থে, উত্যক্ত বিকৃত বাংলা অর্থে নয়; কাইন্ডনেস) এইগুলি পাশব স্তর থেকে মানব স্তরে পৌঁছাবার যাত্রায় দিকনির্দেশ করে। এই কথার নিরিখে আমরা বাংলাদেশের বাঙালীরা এখন কোথায় আছি? ছিলাম মোটামুটি একটা মানবস্তরেযখন গল্পগুচ্ছ লেখা হয়েছে। শরৎচন্দ্র লিখেছেন ব্যক্তিমানব বিশেষ করে নারীর মহিমা ও তাঁর অসহ অবহ বাস্তব নিয়ে। বিএনপি-জোট সরকারযা

কিনা দুইটি সামরিক একনায়কত্ব এবং দুই দশকের পাকিস্তানী উপনিবেশবাদী শোষণ-দখলদারিত্বের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারীসেখান থেকে আমাদের এখন কোথায় এনে ফেলল? এই সরকার, এই সরকারের তাবৎ লোক, সমর্থক এবং ক্যাডার এবং গডফাদারকারো মনে-আচরণে কোনই সম্মান নেই বাংলাদেশের ক্ষমতাবহির্ভূত চৌদ্দ কোটি নাগরিকের প্রতি। আছে কেবলি পিউডাল সময়ে শাসিতের প্রতি শাসকের যা ছিলঅবহেলা, ঘৃণা, মানবেতর জ্ঞান। সেই সহানুভূতি নিরন্ন নিষ্পেষিত নাগরিকের জন্য। এবং একটি সামগ্রিক করুণায় দ্রবীভূত মানসিকতার পরিবর্তে আছে কেবলি ভয়ঙ্কর শুষ্ক, রীতিমত রৌদ্র প্রতিহিংসা ও অনিষ্ট সাধনের আত্মাহীন নিষ্ঠুরতার অন্তহীন অনুষ্ঠান। মানবের পবিত্রতারআশরাফুল মখলুকাত নাকি সেসর্বাত্মক লঙ্ঘন, মানবতার যারপরনাই অপমানের চ্যাম্পিয়ন দেশ এখনকার এই বিএনপি-জামায়াত বাংলা। বাংলাদেশে মানুষ যদি একটিও কেউ টিকে থাকে তার অবশ্যকর্তব্য এই জিন্দানখানা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজা। বিদেশে পালিয়ে গিয়ে নয়। স্বদেশকে সর্ব অর্থে স্বাধীন করে। মানব-জন্তুর দশ লক্ষ বছর ধরে মানবতার লক্ষে অবিরাম তীর্থযাত্রা থেকে আমরা ছিটকিয়ে পড়েছি। এ দেশের প্রতিটি মানুষের প্রথম কর্তব্য সেই মিছিলে আবার লগ্ন হওয়াদেশটাকে। দেশে তখন আবার ফিরবে মানুষের সম্মান সম্ভ্রম, প্রতি মানুষের অপর মানুষের প্রতি সস্নেহ অপেক্ষা।

বর্তমান আঁধি কিংবা তমস্ থেকে সেই আলোকিত যাত্রায় কি আমাদের কেবলি রাজনীতি নিয়ে পারবে? না, কেবলি রাজনীতি নয়। মনুষ্যত্বের সাধনা তো কেবলি রাজনীতির পথে ছোটে না। রাজনীতি বড়ই অর্বাচীন, বড় জোর হাজার দশ বছর তার বয়েস। তার আগের লক্ষ বছর তো মানুষের অন্যমত সব চেষ্টা ছিল, বৈরী প্রকৃতিকে অনুকূল করবার, সুফলদা দল বাঁধবার। সে চেষ্টাগুলি অবশ্যই ছিল মূলত সাংস্কৃতিক। অর্থাৎ শিক্ষা এবং শিল্প ভিত্তিক। মানুষের ক্ষমতা বাড়াবার অনুশীলন, মানুষের হিতকেও বাড়াবার চর্চা রাজনীতির মধ্য দিয়ে ছাড়া কিছু হবার নয়। কিন্তু লাগবে রাজনীতি ছাড়াও প্রচুর কিছু। শিক্ষা আপাতত দখল করে আছে জবরদখলকারীরা, তার বিশাল রাষ্ট্রজোড়া, বিশ্বজোড়া প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগাচ্ছে তারা অন্ধকার ছড়াতে। শিক্ষাকে আবার আলোর, প্রগতির হাতিয়ার করে তুলবার আগে আমাদের জাতীয় নিরাময় নির্মাণের কাজে লাগছে না। এবং শিক্ষাকে সত্যকার শিক্ষা করে তোলাটা কেবলি রাজনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব নয়। শিক্ষার, কিংবা শিক্ষকের এবং শিক্ষাসম্পৃক্ত সকল মানুষের ভিতর থেকেই আসতে হবে পরিবর্তনের তাগিদ এবং শক্তি।

তেমন পরিস্থিতি সুকুমার শিল্পের বেলায়ও। শিক্ষার নির্ভর মূলত বুদ্ধি, সম্মিলিত বুদ্ধি, প্রজন্মান্তরে সঞ্চয়জাত বুদ্ধি। কিন্তু হোয়াইটহেড বলছেন ঐ যে মানব-সম্মান, সহানুভূতি এবং বুদ্ধমূল্য করুণাএসবের বিকাশে বুদ্ধির ভূমিকা গৌণ। সত্যই তো শিল্পাদির চর্চা ও

অনুষ্ঠানে বুদ্ধির অপেক্ষা হয়তো আছে কিন্তু তা গৌণ। নিতান্ত গৌণ। শিল্প করা, গড়ার ভিতর দিয়ে মানুষ নিজে হয়ে ওঠে শিল্পের জীবনে। ঐ যে অপরকে সম্মান, অপরের প্রতি সহানুভূতি, এবং জগজ্জোড়া কাইন্ডনেস, সিস্টার নিবেদিতাকে বিবেকানন্দ যে করুণার অংশ হতে বলেছেন, যার বশে বোধিসত্ত্ব পাঁচশ বার যন্ত্রণাময় ভবে জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন। সেই করুণা এ সবই বৃহৎভাবে বুদ্ধিনিরপেক্ষ অর্জন। আমাদের দেশে গত অর্ধশতকে অন্তত তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিনির্ভর শ্রেণীতে লক্ষ বছরে অর্জিত এই তিন গুণের অভাব নিতান্ত প্রকট। অথচ বঞ্চিত লাঞ্ছিত নিম্নবর্গে একই তিনে ভূষিত মানুষ সংখ্যায় অধিক।

হ্যাঁ, রাজনীতির বুদ্ধি ও ক্ষমতার খেলার বাইরে সমাজ ও মানুষের করবার, হবার একটা বিরাট এলাকা বরাবর ছিল। এখন তা নিতান্ত অবহেলিত। সেই এলাকায় কিছু কাজ হয়েছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিত্তির পাকিস্তানের নির্মাতা বাংলার মুসলিম চাষী-তাঁতী দুই দশক যেতে না যেতে সেই পাকিস্তান ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়। কে যেন তাদের কানে বলে গেল, জাতীয় বিকাশ দরকার তাদের, সাম্প্রদায়িক নয়। জাতীয়তার অমৃতগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে বাঙালী পাকিস্তানকে ভেঙে বাংলাকে গড়ল। রাজনীতি দিয়েই ভাঙলো বটে কিন্তু সেই রাজনীতিতে পৌঁছালো সে জাতীয়তার মত একটা সাংস্কৃতিক ঘটনার কারণে।

ষাটের দশকের সাংস্কৃতির পুনর্জাগরণ, বাঙালীর আপন ভবনে ফিরবার পুনর্জাগরিত সেই আকাঙ্ক্ষা পায়নি তার পূর্ণ চরিতার্থতা। তাই রাষ্ট্র বাংলাদেশ, অনেক দামের বাংলাদেশ, সস্তায় বিকিয়ে যায় দেশবৈরীদের পায়ে। রাজনীতি একলা পথ চলে তো ষাটের দশকের তুল্য কোন অভ্যুত্থান ঘটাতে পারবে না। লাগবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। বাঙালী বাঙালী হলেই ঘুচবে তার বর্তমান দাস্যময়তার তামস। ভাবতে ভাবতে চলে যাই ফরিদপুর। এটা একটা উৎস জায়গা, বাঙালিত্বের। অম্বিকা মজুমদারেরা এখানে থেকে অল-ইন্ডিয়ার রাজনীতি করতেন বটে, কিন্তু সে রাজনীতি বাঙালীকে কী দিল? বরং ফরিদপুরের কালচার হল কালজয়ী। সেই উৎসের কাছে যাই যে মাটি জন্ম দিয়েছে জগদীশ বসু, অতুলপ্রসাদের, একালের সুনীল গাঙ্গুলি, মৃণাল সেন, নীরেন্দ্রনাথের। ছোট্ট কিন্তু অপূর্ব সাফল্যময় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন করলো ফরিদপুর সেদিন। তাতে তিন দিনে যে উৎসবের উদ্বোধনী গেয়েছে, প্রতিটা সকাল-বিকাল অনুষ্ঠানের আরম্ভ আর শেষ গেয়েছে ফরিদপুরের ছেলেমেয়েরা। অসাধারণ সে গান। 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া, বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া' এ গান আরো সার্থক করে, সুন্দর করে গাইতে পারা আমার কাছে মনে হয়েছে অসম্ভব। সে ফরিদপুর গেলাম অসীম দত্ত, সোমনাথ সুর, দীপালি আর আমি। সাহিত্য সংস্থার আবার আসর বসল। সম্মেলনের ফরিদপুর দলটির পুরোটা ছিল না। পরদিন আসর ঈশান স্কুলে। ছেলেমেয়ে আরো কম। মন বেশীক্ষণ খারাপ থাকলো না। ওরা গাইল

’বুঝেছি কি বুঝি নাইবা, সে তর্কে কাজ নাই/ভালো আমার লেগেছে যে রইল সেই কথাই’। রবীন্দ্রনাথের সহজিয়া সেই গান। শেখা শেষে কান্তাকে ধরতে সে অপূর্ব সুরেলা কণ্ঠে শিল্পে মণ্ডিত করে গানটি শোনাল। এক সময় শিখলো তারা ’শ্যামলছায়া নাইবা গেলে শেষ বরষার ধারা ঢেলে।’ সাত সাতটা গান যার মধ্যে ’যাবই আমি ব্যাণিজ্যেতে যাবইব’ মত বড় গানও ছিলসকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত আয়ত্ত করা শেষে তাদের অনেকে যখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললোবুঝেছি কি ঝুঝি নাইবা আর শ্যামল ছায়া গান দুটা কেমন যে! আমাদের মনে হল রবীন্দ্রনাথ যেন এই মুহূর্তে পরম সার্থকতা পেলেন।

গান গাইতে গাইতে কি বদলে যায়? ব্যক্তিমানুষ আর কতটা বদলাবে। তার সবকিছু যে নোঙর করা থাকে মেটিরিয়াল সাকসেসের চূড়ান্ত স্বার্থসর্বস্ব বাস্তবে। কিন্তু বদলায়, ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ভালোর দিকে, শিল্পের অনুশীন-আলোয় দীপ্ত মানুষী করুণায় অভিষিক্ত পথে। গত সপ্তাহের এক সন্ধ্যায় আনন্দধ্বনির বৈঠকশেষে, দোনোমোনো করতে করতে চলেই গেলাম বেঙ্গল গ্যালারিতে, আমাদের অপূর্ব তামান্নার আমন্ত্রণ রাখতে। গিয়ে দেখি লোকারণ্য, কিন্তু মানুষগুলো গাছের মত দাঁড়িয়ে নয়, বসে। কষ্ট করে জায়গা করে নিই।

ডক্টর মহুয়া মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্য বিভাগের প্রধান, উদাহরণ যোগে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বিষয় গৌড়ীয় নৃত্য। আগে তো কখনো শুনিনি এমনতর নাচের কথা। চমকে উঠি। সেই পঞ্চাশের দশক খুঁজেই যাচ্ছি বাঙালীর নাচ। অমলাশঙ্করের কাছে জানতেও চেয়েছিলাম বাঙালীর নাচ কোথায় গেল! বাঙালী সে নাচ না নাচলে কে নাচবে? বাংলা নিশ্চয় নৃত্যশূন্য ছিল না ইতিহাস প্রাগিতিহাসের কোন কালেই। গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়কেও হয়তো বলেছি আমার অশান্তির কথা। বাঙালীর নাচ খুঁজে না পেয়ে স্থির করি মণিপুরীই বাঙলীর নাচ। আমাদের ছায়ানটে তার নিবিড় চর্চার ব্যবস্থা করি। দৈবকৃপায়ই যেন সিলেটে পেয়ে যাই বিপিন সিং শিষ্যা ও শ্যালিকা শান্তিবালা সিংহকে। তার হাতে তুলে দিই ছায়ানটের নৃত্যবিদ্যালয় চিত্রাঙ্গদার সকল ভার। তার অন্তর নিংড়ানো ভালোবাসায় ও অকুণ্ঠিত শ্রমে গড়ে ওঠে ঢাকায় মণিপুরী নৃত্যশৈলীর এক নির্ভরযোগ্য ভিত। এর আগে মাছিমপুরের বাবু রাম সিং দীর্ঘকাল বুলবুল একাডেমিতে মণিপুরী শিখিয়েছেন। এবং ছায়ানটে বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের কার্তিক সিং মণিপুরী করিয়েছেন, আমার আগ্রহাতিশয্যে। কিন্তু শান্তি করলেন সত্যিকারের ভিত পত্তন। এবং আমি বিশ্বাস করি, নিয়ে গেলেন তুলে ঢাকাকে সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ মানে। তামান্না শর্মিলা তাঁরই তো ছাত্রী। এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় ভিজতে ভিজতে শান্তিকে এক গল্প বলেছিলাম। ফরাসী দেশের এক সেনানী, লাফেয়েৎ তাঁর নাম, আমেরিকানদের ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী যুদ্ধে, সসৈন্যে বিদ্রোহীদের পাশে এসে লড়েছিলেন। বিদ্রোহীদের সেই বিজয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন। প্রথম মহাযুদ্ধে এক পর্যায়ে ফরাসী

দেশের রাজধানী পারিস নগরী শত্রু জার্মানদের দখলে চলে যায়। সেই দখল থেকে পারিসকে মুক্ত করেন আমেরিকান বাহিনীর প্রধান জেনারেল পার্শিং। তিনি প্রথমেই কুচ করে যান আর্ক দ্য প্রিয়কে, আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে বলেন, লাফে, এই যে আমরা এসেছি, তোমার ঋণ শোধ করতে। শান্তিকে বলি, তোমাদের কীর্তিমান রাজা ভাগ্যচন্দ্র আত্মসাৎ করেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, তাকে মণিপুর রাজ্যের ও রাজ্যবাসীর ধর্মে পরিণত করেছেন তার আগেই পিতা গরীব নেওয়াজ। ঢাকা অঞ্চলের শান্তিদাস গোস্বামীর প্রভাবে তা হয়। ভাগ্যচন্দ্র কন্যা শিজে লাইরোবি প্রথমে সিলেট ঢাকা দক্ষিণে (শ্রীচৈতন্যের জন্মতীর্থ), পরে খোদ নবদ্বীপে গিয়ে বাঙালী বৈষ্ণবদের সমস্ত গান আর নাচ নিয়ে যান। এ কাজ করতে গিয়ে নিজে থেকে যান আমৃত্যু কুমারী, সন্ন্যাসিনী। সেই থেকে তোমাদের মূল ভিত্তি বঙ্গদেশপালা সেই রাজপুত্রী সন্ন্যাসিনীর দর্শন। ড্রাগ পূজা সম্পৃক্ত যাবতীয় বয়ে আসা হাজার বছরের নাচে। সঙ্গে বঙ্গদেশ পালা মিলিয়েই মণিপুরের নাচ। অর্থাৎ তোমাদের জীবন। শিল্পময় জীবন। শান্তি, তুমি কি জেনারেল পার্শিংয়ের মত ঋণ শোধ করবার চেষ্টা করবে না ঢাকায়? শান্তি তার সাধ্যের সবটা দিয়ে তা করেছিল। পরে তাঁর সূত্রে তাঁর দিদি কলাবতী দেবী ও সাধক ও মহাগুণী গুরু বিপিন সিংয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। এবং ঢাকা মণিপুর নৃত্যশৈলীর এক স্বীকৃত পীঠে পরিণত হয়।

এই নিয়ে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। মহুয়া আমাকে বেশ একটু ঝাঁকিয়ে দিলেন। তিনি আরো আগে গিয়ে বাঙালীর নাচকেই খুঁজে বার করলেন মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য থেকে, ষোড়শ শতাব্দীর এক সংস্কৃত পুঁথি থেকে এবং এখনো টিকে থাকা রায়বেঁশে প্রভৃতি লোকনৃত্য থেকে। ঠিক এই ভাবে কাজ করেছেন গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র ও ওড়িমির বেলায়। ই. কৃষ্ণ আইয়ার করেছেন ভরত নাট্যমের বেলায়-রুক্মিনী অ্যারানডেলের সহায়ক কাজসহ। মহাকবি ভাল্লাতল কেরালা কলামণ্ডলম প্রতিষ্ঠা করেও কথাকলির বেলায় তাই করেছিলেন। মহুয়া যা করছেন, করতে চাইছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁদের কাজের চাইতেও অনেক দুরূহ। কারণ বাংলায় বাঙালীর উচ্চ নৃত্যের অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নৃত্যের কোনই আদল-আভাস-ছিটেফোঁটা কোথাও বর্তমান নেই, অন্তত আমার দেখা ষাট বছরে। উপায়বিহীন মহুয়াকে জীবন্ত নৃত্যের সন্ধান করতে হয়েছে ব্রতচারী নৃত্যে। কুশিয়ারা নদীপারের বীরশ্রী গ্রামে, সিলেট জেলায়, ১৮৮২ সনে যে ছেলেটি জন্মাল এবং কালক্রমে আইসিএস পরীক্ষা ও ব্যারিস্টারি পাস করে পাকা সাহেব এবং ব্রিটিশ আমলের শাসক হয়ে মাত্র তেইশ বছরে দেশে ফিরে এসে এসডিও হয়ে ঔপনিবেশিক সরকারে ঢুকল, সে যে চিরটাকাল রয়ে যাবে এই বাংলারই পারে, তা কেউ ভাবতে পারেনি। সেই ১৯০৫ থেকে তিনি অবিশ্রান্ত সন্ধান করে গিয়েছেন, একচল্লিশ সনে মৃত্যু পর্যন্ত ছত্রিশ বছর বাংলার প্রকৃত গীতনৃত্যকে। তিনি যা পেয়েছেন, আর কেউ তা পায়নি। এত কেউ পায়নি। তিনি যা রক্ষা করেছেন, যতটা করেছেন, আর কেউ তা করেননি।

তারপরে এই মহুয়া মুখ্যোপাধ্যায়। গেছেন তিনি গুরু বিপিন সিংয়ের কাছে। গুরুজি তাঁর ঐকান্তিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সকল সাধ্য দিয়ে সাহায্যে করেছেন। উপদেশ-পরামর্শ, অভিমত-মন্তব্য, বইপত্র দিয়ে। গুরুজি বাবার মতই সঠিক গুণী ছিলেন। ব্রিটিশ আমলের ঢাকায় এসেছেন, সম্ভবত একাধিকবার। মণিপুরী নাচের যে আকর তা তো পূর্ব বঙ্গেই ছিল প্রধানত।

কেলুচরণ মহাপাত্র কেবলি তো গবেষক হয়েই ওডিসি প্রতিষ্ঠিত করেননি। সঙ্গে কাজ করেছে নৃত্যশিল্পী, নৃত্যউদ্ভাবক তাঁর সত্তা। মহুয়া নিজে শিল্পী, কোরিওগ্রাফার। তাঁর তাত্ত্বিক অভ্যগ্র কাজের সঙ্গে মিলুক তাঁর ক্রিয়াসিদ্ধ অর্জন। এবং বাঙালীর মনে সঞ্চারিত হোক তার হারানো নাচকে ফিরে পাবার আর্তি, হারানো ইউসুফকে ফিরে পাবার জন্য যেমনটা হয়েছিল ইয়াকুব নবীর।
হ্যাঁ, সংস্কৃতি অনেক দীর্ঘ মাপের করে সমাজকে বদলায়, এবং সেই পরিবর্তনে সময় লাগে কখনো হয়তো হাজার বছর। রাজনীতি লাগবে এখনকার দুর্দশা মোচনে, সংস্কৃতি লাগবে দুর্দশাহীন জীবনকে সমাজে স্থায়িত্ব দিতে। এবং সেইমত জীবনের সন্ধান যেমন সংস্কৃতিতে, তার প্রতি আর্তিরও উৎস সেই সংস্কৃতিতে। বাঙালীর স্বাধীনতা নানা খলনায়কে উপদ্রুত না হলে, গৌড়ীয় নৃত্য পুনরুজ্জীবন তো এদেশেরই ব্যাপার হত। এখনও যেন তাই হয়, নৃত্যের স্বার্থে নয়, বাঙালীর স্বার্থে। গৌড়ীয় সাম্রাজ্য অনেক বড় ছিল। বিস্তারের তা গিয়ে ঠেকেছিল চালুক্যরাজ মহাবীর দ্বিতীয় পুলকেশীর সাম্রাজ্যের গায়ে। কিন্তু তার প্রাণকেন্দ্র ছিল আমাদেরি সোনা মসজিদের পাশের গৌড়েপৃথিবীর আদি ইক্ষুদেশে।

এমন সমাজ, পারস্পরিক সম্মানের সহানুভূতির এবং সর্বসময় করুণার সমাজ তো কবেই বাঙালীর ছিল, শত প্রতিকূলতায়। হোয়াইটহেডের এই বুদ্ধিসর্বস্বতা-নিরপেক্ষ নিতান্ত মানবিক সমাজকে বাংলাদেশে ফিরতেই হবে। এর বিরুদ্ধে যারা তারা নিপাত যাবে।

ওয়াহিদুল হক ঃ সাংবদিক।

Collection: Khairul Habib
National University of Singapore
June 10, 2004